মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী আপনি কেন হর্ষবর্ধন পড়াবেন

সারোয়ার খালেদ

নতুন মন্ত্রী হয়ে শপথ নেয়ার পরেই জাতিকে প্রথমেই উপদেশ দেয়া আমাদের 'মন্ত্রী সংস্কৃতির' একটি আবশ্যকীয় উপাদান। সুতরাং আমাদের শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক আর ব্যতিক্রমী হবেন কেন। তিনি বললেন, আমাদের শিক্ষায় আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। এতদিন শুধু হর্ষবর্ধনের ইতিহাস পড়ানো হয়েছে। এখন কর্মমুখী শিক্ষা চাই। সিলেবাসে পরিবর্তন আনব।

সম্রাট হর্ষবর্ধনের ইতিহাস তথা ইতিহাসের প্রাচীন যুগ আর পড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে কিনা এবং কর্মমুখী শিক্ষার সাথেও এর বৈপরীত্য কোথায় তা নিয়ে কথা বলার অধিকার এই লেখক রাখে না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমুখী শিক্ষাদীক্ষায় যারা অর্থাৎ যেসমস্ত দেশ এগিয়ে গেছে তারা তাদের ইতিহাস চেতনা পরিহার করেছে কিনা এবং একটি বিজ্ঞান চেতনাসমৃদ্ধ মানসভূমি গড়ার ক্ষেত্রে শেকড় উৎসমূলের সন্ধান পরিত্যাজ্য কিনা সে ভাবনাও এই লেখকের নেই। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা ভাববেন। আর যিনি বলেছেন সেই মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, তিনি কেন বলেছেন তিনিই ভাববেন। তবে সিলেবাসের ওই যে আমূল পরিবর্তনের কথা বললেন, সেই খবরটি পাঠ করে একজন খ্যাতিমান তরুণ সাংবাদিকের মন্তব্য লেখকের মনে ধরেছে। তিনি বললেন, ঠিকই আছে। সবাই যদি এগিয়ে যায় তবে পিছনে পড়ে থাকবে কে? কাউকে না কাউকে তো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে লেফট রাইট করতে হবে। বাংলাদেশ না হয় সেই লেফট রাইটই করবে। তার এই মন্তব্যের কারণ হলো, বিএনপি আমলের পাঠ্যপুস্তক আওয়ামী লীগ পরিবর্তন করল। এখন আবার বিএনপি তা সব বাতিল করে দিয়ে নতুন করে সিলেবাস প্রণয়ন করবে। এভাবেই যদি চলতে থাকে তবে তো তাকে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে লেফট-রাইট করাই বলা যায়। কারণ কোন দেশের পাঠ পরিকল্পনা ৫ বছরের জন্যে হয় না। আমাদের হয়। ইতোমধ্যেই জানা গেছে, শেখ মুজিবুর রহমানের নামের আগে জাতির পিতা ও বঙ্গবন্ধু শব্দটি বাদ দিয়ে এবং জিয়াউর রহমানের আগে স্বাধীনতার ঘোষক জুড়ে দিয়ে স্কুল পর্যায়ে পাঠ্যসূচি পরিবর্তনের কাজ শুরু হয়ে গেছে। ঠিক তেমনি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে একই ধরনের কিন্তু উলটো কাজটি করে রেখেছিল। জিয়াউর রহমানের নামের পূর্বে স্বাধীনতার ঘোষক কথাটি বাদ দেয়া হয়েছিল। আমরা এ বিতর্কে যাব না। শুধু এটুকুই বলব, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কি দলীয় আদর্শ নির্ভর হয়েই থাকবে। এর কি দলনিরপেক্ষ একটা স্বাভাবিক, একটা চিরন্তন কোন গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না? এই আত্মঘাতী খেলায় যারা রয়েছেন তারা আদৌ, শিক্ষিত কি না, লেখাপড়া জানেন কি না; না কি এখন পর্যন্ত তৃতীয় স্তরের উগ্র দল সমর্থকই রয়ে গেছেন সে প্রশ্নই শুধু করা যায়। একটু সহনশীলতা, বিপক্ষের ভাল কিছুকে ভাল বলা, তাকে গ্রহণ করার মতো ন্যূনতম প্রশস্ত মনের সংস্কৃতি যাদের নেই, জাতির ভাবসম্পদের অন্যান্য কিছুর মধ্যে শিক্ষাও তাদের হাতে কতখানি নিরাপদ তা তো বোঝাই যায় শিক্ষার আজকের দৈন্যদশা দেখে। তার সত্যিকার অর্জন দেখে।

সুতরাং আমি এ প্রসঙ্গে এখানে একটা ভিন্নতর দিক তুলে ধরতে চাচ্ছি। বলা যায়, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে অবগত করতে চাচ্ছি। তাকে জ্ঞান দিতেও চাচ্ছি। কারণ আমাদের সাধারণ একটা বিনয় হলো, জ্ঞান দেয়াকে ধৃষ্টতা বলা। শিক্ষামন্ত্রীকে জ্ঞান দেয়া ধৃষ্টতারই নামান্তর। আমি না হয় সাহস বা বদসাহস করে সেই ধৃষ্টতাই দেখালাম। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী দীর্ঘকাল দেশের বাইরে কাটিয়েছেন। তার পরামর্শ দেয়ার কাঠামোগত মেশিনারি সত্যিকার অর্থেই 'আনরিপ্রেজেনটেড।' সব আমলে এতকাল তাই থেকে আসছে। আমি বলি, সংকীর্ণ রাজনীতি বা জেদাজেদির কারণে সিলেবাস পালটাপালটির বিষয়টি থাক। আমরা সাদাকে সাদা বলতে যদি সম্মত হই, তবে বলব আপাতত সিলেবাস বদলানো নয় গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বা শিক্ষা প্রশাসনের দিকে নজর দিলেই অনেক ভাল ফল পাওয়া যাবে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে আমাদের যে পাঠ্য কর্মসূচি রয়েছে তা বিশেষজ্ঞদের দ্বারাই প্রণীত হয়েছিল এবং এই বিশেষজ্ঞদের কেউই কট্টর আওয়ামী-বাকশালী ছিলেন না। যে পাঠ্যসূচি প্রণীত হয়েছিল তাকে অতি উত্তম বলে বিতর্কে না জড়ালেও এটুকু বলব এর কিন্তু আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। আমাদের উপমহাদেশের বিভিন্ন দেশের সাথে মিলিয়ে দেখলেই তা বোঝা যাবে। বিশেষ করে বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান এবং ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রে। কিন্তু গলদ তার বাস্তবায়ন পর্যায়ে। এখানেই সীমাবদ্ধতা। সুতরাং এখানেই শিক্ষা প্রশাসনের প্রশ্নটি উঠে আসে।

বেসরকারি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ে প্রচণ্ড দক্ষ শিক্ষকের অভাব। ফলে সেখানে আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক সিলেবাস হওয়ার পরেও তা বাস্তবায়িত হতে পারছে না। বেসরকারি স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে ছাত্রভর্তি করা হয় মূলত শিক্ষকদের এবং প্রতিষ্ঠানের রুজি-রোজগারের দিকে লক্ষ্য রেখেই। শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। পাঠ্যসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তার কোন যথার্থ মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা নেই। নেই কোন দায়বদ্ধতা। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি বর্তমানে এর যে চরিত্র তাতে বলা যায়, এর গোটাটাই সুষ্ঠু শিক্ষাদানের অন্তরায়।

প্রায় সবগুলো ক্ষেত্রেই দলীয় ক্ষমতাধর, হঠাৎ পয়সা হওয়া অশিক্ষিতরাই পরিচালনা কমিটির কেষ্টবিষ্টু। শিক্ষকদের সাথে এবং প্রতিষ্ঠান প্রশাসনের সাথে পরিচালনা কমিটির দ্বন্দ্ব এবং বিভিন্ন সমীকরণের টানাপোড়েনই হলো আজকের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বাস্তব চিত্র। এই আবর্তে বেসরকারি শিক্ষকরাও হারিয়ে ফেলছে তাদের শিক্ষকসুলভ মানসিকতা, আচরণ এবং জীবনাচার। সুতরাং এখানে কি করা যায় তাই ভাবা দরকার। এছাড়া বেসরকারি শিক্ষকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থানীয় তো বটেই, এমনকি দলীয় রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়ছেন। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের রাজনৈতিক অবস্থান আধুনিক মন ও মননের পরিপন্থী। এতে যত প্রাগ্রসর পাঠ্যসূচিই হোক, শিক্ষকদের চেতনা, জ্ঞানের পরিধি যদি পিছিয়ে থাকে তাহলে কি শিক্ষা যে হবে তা তো বোঝাই যায়। এখন আমাদের তাই হচ্ছে। দুঃখের সাথে বলতে হয়, কোন আমলেই এই শিক্ষক চেতনার প্রশ্নটি গুরুত্ব পায়নি। তার ওপরে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ভৌত সুযোগ-সুবিধার সীমাবদ্ধতা তো রয়েই গেছে। ভবন নির্মাণের বা ল্যাবরেটরি সাজানোর কোন অনুদান এলে বারো ভূতেই তা লুটেপুটে খায়। তলানি যা অবশিষ্ট থাকে সেটা শিক্ষার কোন কাজে লাগে না।

সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক সংকট তেমন একটা তীব্র নয়। এখানে শিক্ষক ব্যবস্থাপনার সংকট বিদ্যমান। দেখা গেছে, গ্রাম পর্যায়ের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নেই। কিন্তু শহরগুলোতে শিক্ষক অনেক বেশি রয়েছে। এখানে থানা থেকে জেলা সদর পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের একটা দুর্নীতির নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে। তা অধিদপ্তর পর্যন্ত বিস্তৃত।

তবে এখানে প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও শ্রেণীকক্ষে তার বাস্তবায়ন হয় না। কোন মনিটরিংয়ের ব্যবস্থাও নেই। মাধ্যমিক পর্যায়ে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক বিশেষ করে দক্ষ শিক্ষকের সংকট এখন তীব্র।

সবচেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি বিরাজ করছে সরকারি কলেজগুলোতে। বিশেষ করে বিগত আমল থেকে কলেজগুলোতে ধুন্ধুমার অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স খুলে দেয়া হচ্ছে। এর অধিকাংশ, অধিকাংশ কেন বলব গোটা দেশে হাতেগোনা ৫/১০টা বাদ দিলে প্রায় সব কলেজেরই চালচুলা নেই। তারপরেও অনার্স ও মাস্টার্স চালু করা হয় রাজনৈতিক চাপে। এমন অনেক কলেজ আছে যেখানে ১৪/১৫টা বিষয়ে অনার্স চালু হয়েছে। ৭/৮টা বিষয়ে মাস্টার্স চালু হয়েছে। এদের ক্লাসরুম নেই, লাইব্রেরি নেই, ল্যাবরেটরি প্রায় শূন্য এবং সর্বোপরি প্রয়োজনীয় শিক্ষক নেই। বিস্ময়ের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত হলো এমন অনেক বিভাগ আছে যেখানে শিক্ষক মাত্র ২ জন। তবে রাজধানী ও দেশের অন্যত্র কতিপয় পুরানো কলেজ বাদ দিলে, কোন কলেজেই অনার্স-মাস্টার্স বিভাগে তিন থেকে ৪ জনের বেশি শিক্ষক নেই।

উচ্চ শিক্ষা বলব কিনা জানি না, তবে এতে শিক্ষার শুধু ১২টা বাজেনি, ১৩টাও বাজানো হয়েছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে প্রস্তাব রাখব, এধরনের দু'একটি কলেজে হঠাৎ ঘুরে আসুন। আমি নিশ্চিত, এদের শিক্ষার গুণগত মান, ব্যবস্থাপনা দেখে আপনি আর স্বাভাবিক থাকবেন না। সুতরাং এখানে শিক্ষক বাড়ানো এবং তার জন্যে পদ সৃষ্টি করা ও অবকাঠামোগত সুযোগের সম্প্রসারণ কি অতি জরুরি হয়ে পড়েনি?

এদিকে সব আমলেই সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারকদের ধারণা সরকারি কলেজের শিক্ষকদের ঠ্যাঙাতে পারলেই কলেজ পর্যায়ের উচ্চ শিক্ষার সমস্যার সমাধান হবে। অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়কে সেভাবেই সাজানো হয়ে থাকে। বাস্তবতা বিবর্জিত তথাকথিত কত শক্তপোক্ত প্রশাসন চালু করা যায় সেটাই মনে হয় রাজনৈতিক অভিপ্রায়। সম্প্রতি দু'দুটো পদোন্নতি প্রক্রিয়ায় কলেজ শিক্ষকদের দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেভাবে বদলি করা হয়েছে তাতে শিক্ষকের শুধু পারিবারিক জীবন নয়, পেশাগত জীবন ও শিক্ষা ব্যবস্থাটাই একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে নিদারুণ বৈষম্যও করা হয়েছে এমন দৃষ্টান্তও রয়েছে। উল্লেখ্য, প্রশাসন ক্যাডারের সদস্যদের বদলি আর শিক্ষকদের বদলির মধ্যে চরিত্রগত পার্থক্য রয়েছে। শিক্ষকদের বদলির ক্ষেত্রে দুর্নীতি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। যাকে বলা হয়, 'বদলি বাণিজ্য'। আসলেই শিক্ষকদের এ জাতীয় বদলির প্রয়োজন আছে কিনা, এতে শিক্ষাদান প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় কিনা এবং পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতেও এমন দৃষ্টান্ত রয়েছে কিনা তা ভাবা দরকার। না, শাস্তিযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্র ছাড়া শিক্ষক বদলি নয়, তাদের আপগ্রেডের মাধ্যমে পদোন্নতি কার্যকর করা যায় কিনা ভেবে দেখার এখন সময় এসেছে। সরকারি কলেজ শিক্ষকদের বদলির কাজেই প্রধান দুর্নীতিটা হয়ে থাকে শিক্ষা প্রশাসনে। একেই বলে বদলি বাণিজ্য।

(৯-এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

NOV. 24 2001